বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা

ইন্দ্রিমিত্র

বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা
ইন্দ্রমিত্র

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৯

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য: ১৭৫ টাকা

VIDYASAGARER CHELEBELA [Biography] by Indramitra Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Edition: February 2019 Cell: +88-01717217335 Phone: 02-9668736
Price: 175 Taka RS: 175 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-94103-6-2

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্তী
শ্রদ্ধাস্পদেষু

নিবেদন

বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তর থেকে উদ্ধার করা গেছে। সেজন্য আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তরের কাছে আমার ঋণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করছি।

ইন্দ্রমিত্র

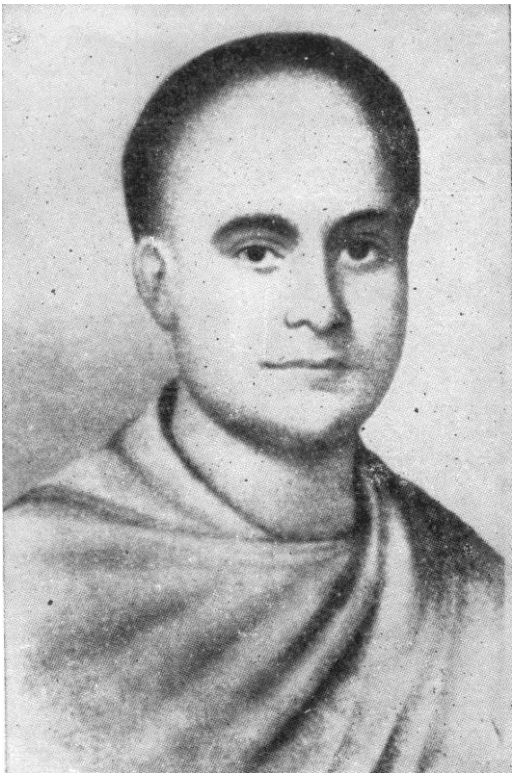

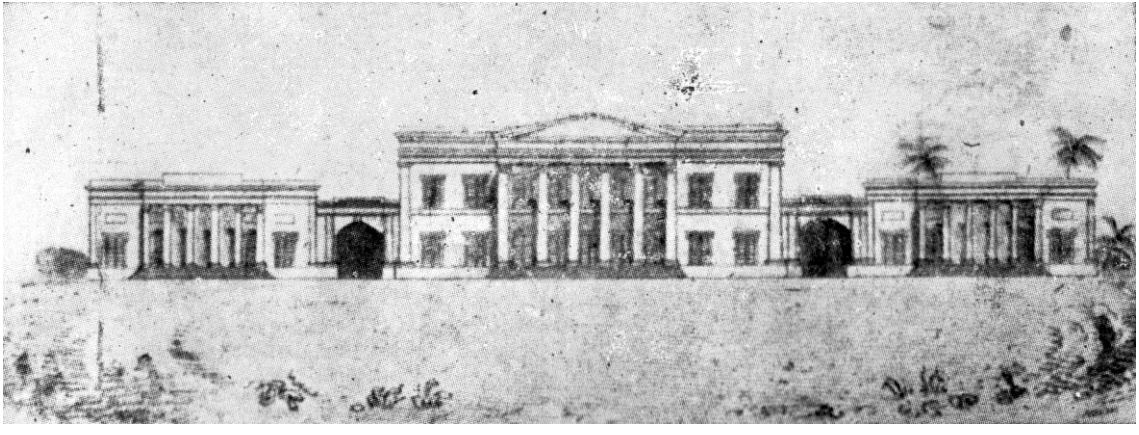

সংস্কৃত কলেজ
১৮৩২ সালে লিথোপ্রেসে মুদ্রিত একখানা ছবি থেকে

এক

বনমালিপুরে থাকতেন ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। তাঁর পাঁচ ছেলে; নৃসিংহরাম, গঙ্গাধর, রামজয়, পঞ্চানন, রামচরণ। একান্নবর্তী পরিবার।

ভুবনেশ্বরের মৃত্যুর পর সংসারে কর্তৃত্ব করতে লাগলেন নৃসিংহরাম আর গঙ্গাধর। সংসারে ভাঙন ধরল। অবস্থা ক্রমশ এমন হয়ে উঠল যে রামজয় সংসার ছেড়ে গেলেন। সংসার ছেড়ে রামজয় নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন, সংসারে রেখে গেলেন তাঁর স্ত্রী দুর্গাকে, তাঁর দুটি ছেলেকে, চারটি মেয়েকে।

কিন্তু দুর্গাও বেশি দিন থাকতে পারলেন না শ্বশুরের ভিটেয়। বাধ্য হয়ে তাঁকেও চলে আসতে হল বাপের বাড়িতে। বীরসিংহে। দুর্গা আর তাঁর ছয়টি ছেলেমেয়ে। দুটি ছেলে: ঠাকুরদাস আর কালিদাস। চারটি মেয়ে: মঙ্গলা, কমলা, গোবিন্দমণি, অন্নপূর্ণা।

দুর্গা বীরসিংহের উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের মেয়ে। উমাপতি মস্ত পণ্ডিত। তখন বৃদ্ধ হয়েছেন। সংসারের কর্তৃত্ব করেন উমাপতির ছেলে আর ছেলের বউ। অর্থাৎ দুর্গার ভাই আর ভাইয়ের বউ।

কিছুদিনের মধ্যেই দুর্গা বুঝতে পারলেন, ভাই আর ভাইয়ের বউ খুশি হননি। কতকাল দুর্গা আর তাঁর ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে-পরাতে হবে ঠিক কী—এই ভাবনাতেই দুর্গার ভাই আর ভাইয়ের বউ বিরূপ হয়ে উঠেছেন। ভাইয়ের বউ কথায়-কথায় এমন কথা বলেন যাতে দুর্গার মান থাকে না।

উমাপতি একটা ব্যবস্থা করে দিলেন তখন। নিজের বাড়ির কাছাকাছি একখানা কুঁড়েঘর বানিয়ে দিলেন। ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেই কুঁড়েঘরে কায়ক্লেশে দিন কাটাতে লাগলেন দুর্গা। সুতো কাটতেন দুর্গা। সামান্য কিছু আয় হত তাতে। উমাপতি মাঝে-মাঝে কিছু কিছু সাহায্য করতেন। তবু সংসার চলে না, চলবার কথা নয়।

ঠাকুরদাসের বয়স তখন চোদ্দো-পনেরো বছর। ঠাকুরদাস সাব্যস্ত করলেন, কলকাতা যাবেন, টাকা রোজগার করবেন, মা-ভাই-বোনের দুঃখ ঘোচাবেন।

মায়ের অনুমতি নিয়ে ঠাকুরদাস চলে এলেন কলকাতায়। এলেন জগন্মোহন ন্যায়ালঙ্কারের কাছে। কাঁদতে-কাঁদতে তাঁর কাছে সব কথা বললেন, সাহায্য চাইলেন, আশ্রয় চাইলেন।

জগন্মোহনের বাড়িতে আশ্রয় পেলেন ঠাকুরদাস।

আশ্রয় তো পেলেন, কিন্তু মা-ভাই-বোনের দুঃখ দূর করার উপায় কী? একমাত্র উপায় হচ্ছে ইংরেজি শেখা। মোটামুটি ইংরেজি শিখলেই সদাগরি আপিসে কাজ পাওয়া যাবে। মা-ভাই-বোনের দুঃখ তা হলে নিশ্চয়ই দূর করা যাবে। হ্যাঁ, ইংরেজিই একমাত্র উপায়।

কিন্তু ইংরেজি শেখাবে কে? সে ব্যবস্থাও জগন্মোহন করে দিলেন। জগন্মোহনের একজন বন্ধু ইংরেজি জানেন। তিনি ঠাকুরদাসকে ইংরেজি শেখাতে রাজি হলেন।

সন্ধ্যাবেলা ঠাকুরদাস ইংরেজি শিখতে যেতেন। ফিরতে রাত হয়ে যেত।

দিনের পর দিন যায়।

এই দিন সেই ভদ্রলোক ঠাকুরদাসকে জিজ্ঞেস করলেন—দিনে-দিনে তুমি এমন রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন?

ঠাকুরদাস চুপ করে রইলেন, তাঁর দু'চোখ জলে ভরে উঠল। ভদ্রলোক পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

যে বাড়িতে ঠাকুরদাস আশ্রিত, সন্ধ্যার পরেই সেখানে উপরি লোকের খাওয়া-দাওয়ার পালা শেষ হয়ে যায়। ঠাকুরদাস তখন ইংরেজি শিখতে আসেন। তাই রাত্রে আর খাওয়া জোটে না।

যাঁর কাছে ইংরেজি শিখতেন ঠাকুরদাস, তাঁর একজন আত্মীয় তখন ওখানে উপস্থিত। বৃত্তান্ত শুনে তিনি ঠাকুরদাসকে বললেন—যা শুনলাম, তোমার আর ও বাড়িতে থাকা হবে না। তুমি যদি রেঁধে খেতে পার, তা হলে আমি তোমাকে আমার বাসায় রাখতে পারি।

তাই হল।

কিন্তু এই আশ্রয়দাতার মনপ্রাণ যেমন ভাল, আয়-আদায় তেমন ভাল নয়। দালালি করতেন ভদ্রলোক। এই সময়েই আবার ভদ্রলোকের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ল। দিন চলে না। বাইরে-বাইরে ঘোরেন ভদ্রলোক, কিছু রোজগার হলে দুপুরবেলা বাসায় আসেন। দু'জনেরই কোনও দিন অর্ধাহার, কোনওদিন অনাহার। কোনও-কোনও দিন ভদ্রলোক দিনের বেলা বাসায় আসেন না। সে সময়ে ঠাকুরদাসকে সমস্ত দিন উপোস করে থাকতে হয়।

ঠাকুরদাসের সম্বলের মধ্যে আছে একখানা পিতলের থালা, একটা ছোট ঘটি। থালাখানা বিক্রি করে দিলে ক্ষতি কী? না, ক্ষতি নেই, বরং থালা বিক্রির পয়সায় খাবার কেনা যাবে। আর থালার কাজ চালানো যাবে শালপাতায়।

থালাখানা নিয়ে নতুন বাজারে কাঁসারিদের দোকানে গিয়ে উপস্থিত হলেন ঠাকুরদাস। কিন্তু সকলেই একবাক্যে ঠাকুরদাসকে ফিরিয়ে দিল। বলল—অচেনা-অজানা লোকের কাছে পুরনো বাসন কিনতে পারব না। পুরনো বাসন কিনে কখনও-কখনও বড় ফ্যাসাদে পড়তে হয়। আমরা তোমার থালা নেব না।

এক দিন দুপুর রোদে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ঠাকুরদাস। বড়বাজার থেকে

ঠনঠনে পর্যন্ত হেঁটে এলেন। সে দিন পেটে এককণা খাবার নেই, শরীর আর বইতে চায় না। ভেবেছিলেন, হাঁটাহাঁটি করলে ক্ষিদের কষ্ট থাকবে না, কিন্তু উল্টো ফল হল, হাঁটাহাঁটিতে আরও কাহিল হয়ে পড়লেন। একটি মধ্যবয়সী বিধবা স্ত্রীলোকের মুড়ি-মুড়কির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞেস করলেন—বাবাঠাকুর, দাঁড়িয়ে আছ কেন?

ঠাকুরদাস বললেন—একটু জল খেতে চাই।

সাদরে ও সস্নেহে ঠাকুরদাসকে বসতে বললেন স্ত্রীলোকটি। বামুনের ছেলেকে শুধু জল দিলে পাপ হবে। স্ত্রীলোকটি মুড়কি দিলেন, জল দিলেন।

নিদারুণ ক্ষুধায় ব্যগ্রভাবে মুড়কি খেলেন ঠাকুরদাস। সে দৃশ্য স্ত্রীলোকটি একদৃষ্টিতে দেখলেন। বললেন—আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয়নি বাবাঠাকুর?

—না, মা, আজ আমি এখন পর্যন্ত কিছুই খাইনি।

স্ত্রীলোকটি তখন জল খেতে বারণ করলেন ঠাকুরদাসকে। খানিক অপেক্ষা করতে বললেন। কাছাকাছি গয়লার দোকান থেকে দই নিয়ে এলেন। মুড়কির সঙ্গে দই দিয়ে পেট ভরে ফলার খেতে দিলেন ঠাকুরদাসকে।

ঠাকুরদাসের মুখে তাঁর ইতিবৃত্ত শুনলেন স্ত্রীলোকটি। জিদ করে বললেন—যে দিনই দরকার হবে, এখানে এসে ফলার করে যেও।

ঠাকুরদাস যেতেন ওখানে। দিনের বেলা যখন কিছু খাবার জুটত না, ওখানে গিয়ে পেট ভরে ফলার করে আসতেন।

নিজের দিনগুলো তো যা-হোক কেটে যাচ্ছে, কিন্তু মা-ভাই-বোন? তাদের ক্লিষ্ট মুখ অহরহ চোখের উপর ভাসতে থাকে। ঠাকুরদাস একদিন আশ্রয়দাতা ভদ্রলোকের কাছে কেঁদে পড়লেন—কোথাও আমাকে একটু কাজকর্ম যোগাড় করে দিন। আমি আর পারি না। মা-ভাই-বোনের কথা মনে পড়লে আমার আর এক মুহূর্ত বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে না।

এই ভদ্রলোক ঠাকুরদাসকে একটা কাজ জুটিয়ে দিলেন। মাইনে দু'টাকা। খুশি হলেন ঠাকুরদাস। তা বলে নিজের খরচ এক কপর্দকও বাড়তে দিলেন না। মাইনের দু'টাকাই বাড়িতে পাঠান মা-ভাই-বোনের জন্য। এ দিকে তাঁর কাজকর্ম দেখে মনিবও খুব খুশি। দু-তিন বছর পরে ঠাকুরদাসের মাইনে পাঁচ টাকা হয়ে গেল।

ও দিকে একটা মস্ত ঘটনা ঘটল এই সময়ে। সাত-আট বছর পরে ঠাকুরদাসের বাবা রামজয় সংসারে ফিরে এলেন। সংসার ছেড়ে নানা তীর্থে ঘুরেছেন এতকাল। দ্বারকায়, জ্বালামুখীতে, বদরিকাশ্রমে।

বিদ্যাসাগরের সেজো ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "রামজয় এক দিবস (কেদার পাহাড়ে) নিশীথ সময়ে স্বপ্নে দেখেন যে, রামজয়! তুমি বৃথা কেন ভ্রমণ করিতেছ? স্বদেশে যাও, তোমার বংশে এক সুপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি তোমার বংশের তিলক হইবেন। তিনি সাক্ষাৎ দয়ার সাগর ও অদ্বিতীয় পণ্ডিত

হইয়া নিরন্তর বিদ্যা দান ও নিরুপায় লোকদিগের ভরণপোষণাদির ব্যয়নির্ব্বাহ দ্বারা তোমার বংশের অনন্তকালস্থায়িনী কীর্ত্তি স্থাপন করিবেন। রামজয় পাহাড়ের মধ্যে নিশীথ সময়ে এরূপ অসম্ভব স্বপ্ন-দর্শন চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি বহুদিন অতীত হইল সংসারাশ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া নিভৃত স্থানে ঈশ্বরারাধনায় মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া কালাতিপাত করিতেছি। এক্ষণে তাহারা কি করিতেছে ও কে আছে না আছে তাহাও জানি না। এবম্বিধ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পুনর্ব্বার নিদ্রাভিভূত হইলে কে যেন বলিয়া দিল, তুমি পরিবারগণের নিকট প্রস্থান কর, আর বিলম্ব করিও না; তোমার প্রতি ঈশ্বর সদয় হইয়াছেন। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে নানাপ্রকার ভাবিয়া চিন্তিয়া রামজয় স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন...।"

সংসারে ফিরে এসেছেন রামজয়। দেশে এসে প্রথমেই গিয়েছিলেন বনমালিপুরে। সেখানে গিয়ে দেখেন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কেউই নেই। চলে এসেছেন তারপর বীরসিংহে। উত্তরকালে বিদ্যাসাগর লিখেছেন: "শ্বশুরালয়ে বা শ্বশুরালয়ের সন্নিকটে, বাস করা তিনি (রামজয়) অবমাননা জ্ঞান করিতেন, এজন্য, কিছুদিন পরেই, পরিবার লইয়া, বনমালিপুরে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু, দুর্গাদেবীর মুখে ভ্রাতাদের পরিচয় পাইয়া সে উদ্যম হইতে বিরত হইলেন এবং নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক, বীরসিংহে অবস্থিতি বিষয়ে সম্মতিপ্রদান করিলেন। এইরূপে, বীরসিংহগ্রামে, আমাদের বাস হইয়াছিল।"

রামজয় সম্পর্কে এখানে দু-চার কথা বলে রাখা ভাল।

রামজয় তর্কভূষণের যেমন অপার সাহস, তেমনি অগাধ শক্তি। একখানা লোহার ডাণ্ডা ছিল তাঁর। সেখানা হাতে না নিয়ে তিনি কখনও বাড়ি থেকে বেরোতেন না।

সে সময়ে পথে ডাকাতের ভয় ছিল খুব। অনেক জায়গায় লোকজন বড় রকম দল না বেঁধে যেতে সাহস পেত না। কিন্তু রামজয় তর্কভূষণের প্রাণে ভয়ডর নেই। লোহার ডাণ্ডাখানা হাতে নিয়ে তিনি নির্ভয়ে ওসব জায়গায় একা যাতায়াত করতেন। ডাকাতেরা দু-চারবার তাঁকে আক্রমণ করছে এবং উপযুক্ত আক্কেলসেলামি পেয়েছে। পরে ডাকাতেরা আর তাঁকে আক্রমণ করতে সাহস পায়নি।

ডাকাত দূরের কথা, হিংস্র জন্তু-জানোয়ারকেও রামজয় পরোয়া করতেন না তেমন।

একুশ বছর বয়সে রামজয় একবার একা মেদিনীপুর যাচ্ছিলেন। ও দিকে তখন বিস্তর বনজঙ্গল। এবং বনজঙ্গলে যাদের থাকবার কথা তারাও আছে। অর্থাৎ, বাঘ ভালুক ইত্যাদি।

রামজয় এক জায়গার খাল পার হয়ে পাড়ে উঠেছেন, এমন সময় একটা ভালুক এসে পড়ল। নখের আঁচড়ে রামজয়ের সারা শরীর ক্ষত-বিক্ষত করে দিল। রামজয়ও ছাড়লেন না, সমানে তাঁর লোহার ডাণ্ডাখানা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

ভালুকটা ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ল। রামজয় তারপর লাথির পর লাথিকে ভালুকটাকে মেরে ফেললেন।

রামজয়ের সমস্ত শরীর থেকে তখন অনবরত রক্ত পড়ছে। ওই অবস্থায় প্রায় চার ক্রোশ হেঁটে রামজয় মেদিনীপুরে এসে পৌঁছলেন। উঠলেন এক আত্মীয়ের বাসায়। দু-মাস সেখানে শয্যাশায়ী থাকতে হল। তারপর বাড়ি ফিরে এলেন।

কিন্তু ওই ক্ষতচিহ্ন ইহজীবনে তাঁর শরীর থেকে মিলিয়ে যায়নি।

উত্তরকাল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখেছেন:

"(রামজয়) তর্কভূষণ মহাশয় নিরতিশয় অমায়িত ও নিরহঙ্কার ছিলেন; কি ছোট, কি বড় সর্ব্ববিধ লোকের সহিত, সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন। তিনি যাঁহাদিগকে কপটবাচী মনে করিতেন, তাঁহাদের সহিত সাধ্যপক্ষে আলাপ করিতেন না। তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন, ইহা ভাবিয়া, স্পষ্ট কথা বলিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেন না। তিনি যেমন স্পষ্টবাদী, তেমনই যথার্থবাদী ছিলেন। কাহারও ভয়ে, বা অনুরোধে, অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি, কখনও কোনও বিষয়ে অযথা নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি যাঁহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখিতেন, তাঁহাদিগকেই ভদ্রলোক বলিয়া গণ্য করিতেন; আর যাঁহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান্, ধনবান্ ও ক্ষমতাসম্পন্ন হইলেও, তাঁহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।

ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন, বটে; কিন্তু, তদীয় আকারে, আলাপে, বা কার্য্যপরম্পরায়, তাঁহার ক্রোধ জন্মিয়াছে বলিয়া, কেহ বোধ করিতে পারিতেন না। তিনি, ক্রোধের বশীভূত হইয়া, ক্রোধবিষয়ীভূত ব্যক্তির প্রতি কটূক্তি প্রয়োগে, অথবা তদীয় অনিষ্ট চিন্তনে কদাচ প্রবৃত্ত হইতেন না। নিজে যে কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারা যায়, তাহাতে তিনি অন্যদীয় সাহায্যের অপেক্ষা করিতেন না; এবং কোনও বিষয়ে, সাধ্যপক্ষে পরাধীন বা পরপ্রত্যাশী হইতে চাহিতেন না। তিনি একাহারী, নিরামিষাশী, সদাচারপূত, ও নিত্যনৈমিত্তিক কর্মে সবিশেষ অবহিত ছিলেন। এজন্য, সকলেই তাঁহাকে, সাক্ষাৎ ঋষি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন।"

একবার চমৎকার একটা মজার কথা বলেছিলেন রামজয় তর্কভূষণ। বলেছিলেন বীরসিংহে।

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, সে সময়ের বীরসিংহ গ্রামের কর্তাব্যক্তিরা ছিলেন 'নিরতিশয় স্বার্থপর ও পরশ্রীকাতর'। নিজেদের লাভের জন্য তাঁরা না করতে পারতেন এমন কাজ নেই। তা ছাড়া সময়ে-সময়ে দারুণ নির্বোধের মতো কাজ করে ফেলতেন তাঁরা। রামজয় তর্কভূষণ ঘোরতর অপছন্দ করতের তাঁদের। স্পষ্ট ভাষায় বলতেন—এ গ্রামে একটাও মানুষ নেই, সকলই গোরু।

লোকেরা একটা জায়গা নোংরা করে রেখেছে, আর রামজয় সেই জায়গা দিয়েই চলে যাচ্ছেন। গ্রামের একজন কর্তাব্যক্তি বললেন—তর্কভূষণ মশায়, ওখান দিয়ে যাবেন না।

তর্কভূষণ জিজ্ঞেস করলেন—দোষ কী?

—ওখানে বিষ্ঠা আছে।

খানিকক্ষণ অপলকে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন রামজয় তর্কভূষণ। তারপর বললেন—এখানে বিষ্ঠা কোথায়? আমি গোবর ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। যে গ্রামে একটাও মানুষ নেই, সেখানে বিষ্ঠা কোত্থেকে আসবে?

রামজয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "এই হাস্যময় তেজোময় নির্ভীক ঋজুস্বভাব পুরুষের মতো আদর্শ বাংলাদেশে অত্যন্ত বিরল না হইলে বাঙালীর মধ্যে পৌরুষের অভাব হইত না।...এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পৌত্রকে আর কোন সম্পত্তি দান করিতে পারেন নাই, কেবল যে অক্ষয় সম্পদের উত্তরাধিকার বণ্টন একমাত্র ভগবানের হস্তে, সেই চরিত্রমাহাত্ম্য অখণ্ডভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পৌত্রের অংশে রাখিয়া গিয়াছিলেন।"

আবার আগের কথায় ফিরে আসা যাক।

কয়েকদিন বীরসিংহে কাটিয়ে রামজয় গেলেন কলকাতায়। বড় ছেলে ঠাকুরদাস কলকাতায় থাকে। কাজ করে।

বড়বাজারের ভাগবতচরণ সিংহের বেশ ভাল অবস্থা। রামজয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তাঁর। রামজয়ের সমস্ত ইতিহাস শুনলেন তিনি। রামজয়কে বললেন—ঠাকুরদাসকে আমার কাছে রেখে যান।

তাই হল। ঠাকুরদাস উঠে এলেন ভাগবতচরণের বাড়িতে। ভাগবতচরণই ঠাকুরদাসকে আর একটা কাজ জুটিয়ে দিলেন। আট টাকা মাইনে। আর দু'বেলা খেতে পাওয়া যায় ভাগবতচরণের বাড়িতে।

ঠাকুরদাসের বয়স তেইশ কি চব্বিশ বছর। বিয়ে হল তখন। বিয়ে হল ভগবতীর সঙ্গে। ভগবতীর বাড়ি গোঘাটে, বাবার নাম রামকান্ত তর্কবাগীশ। ভগবতীর মামাবাড়ি পাতুলে, মাতামহের নাম পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ।

উত্তরকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখেছেন:

"পাতুলনিবাসী মুখটী পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশের চারি পুত্র ও দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠ রাধামোহন বিদ্যাভূষণ, মধ্যম রামধন ন্যায়রত্ন, তৃতীয় গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়; জ্যেষ্ঠা গঙ্গা, কনিষ্ঠা তারা। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিজ বাটিতেই চতুষ্পাঠী ছিল। এই চতুষ্পাঠীতে, তিনি স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। তিনি, স্বগ্রামে ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে, সবিশেষ আদরণীয় ও সাতিশয় মাননীয় ছিলেন।

জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গা বিবাহযোগ্য হইলে, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়, গোঘাটে একটি সুপাত্র আছে, এই সংবাদ পাইয়া, ওই গ্রামে উপস্থিত হইলেন। পাত্রের নাম রামকান্ত চট্টোপাধ্যায়। ইনি সাতিশয় বুদ্ধিমান ও নিরতিশয় পরিশ্রমী ছিলেন; অবাধে অধ্যয়ন করিয়া, একুশ বাইশ বৎসরে, ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্রে বিলক্ষণ